গেরুয়া শাসনের দু'মাস

পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া রাজ প্রথমবার। আদি এবং নব্য মিলে শুভেন্দুবাবুর ক্যাবিনেট জমজমাট।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম

সান্দেশ

মন-হরণ করে জি.আই ট্যাগ

হুগলির জনাইয়ের "মনোহরা" নামে মিষ্টি পেল জিআই ট্যাগ।

Monthly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 7 ● July 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

সবাই পারে, ভারত পারে না

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় : সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল! ১৯৭১ সালে ধন্যি মেয়ে সিনেমায় মান্না দে-র কণ্ঠে গাওয়া গানটি আজও অমর। অদ্ভুত একটা রোমান্টিসিজম রয়েছে গানের প্রতিটা লাইনে।

বাংলা ও বাঙালির কাছে 'চর্মগোলকে লাথি' মারা শুধু একটি খেলা নয়, আবেগ। ভালোবাসাও। 'আট থেকে আশি, ফুটবল নিয়ে বাঁচি', এমন স্লোগান বাঙালি সমাজে মূলত দুইটি সময় শোনা যায়। এক, যখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি হয়। ঘটি-বাঙালের চিরন্তন আকচাআকচি সামনে আসে। দুই, যখন ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসে দুনিয়ার কোনও এক প্রান্তে। আর সেই ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে রাত জেগে ব্রাজিল নাম আর্জেন্টিনার মাধ্যমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় আপামর বাঙালি। শুধু ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা কেন, ফ্রান্স-জার্মানি-স্পেন-ইতালিরমতো দেশের জন্যও গলা ফাটায় বাঙালি। রাত জেগে খেলা দেখে ফুটবল উন্মাদ হয়ে যায়। ভেসে যায় ফুটবল আবেগের স্রোতে।

নিখাদ আবেগ চান? পাবেন। ফাটাফাটি উন্মাদনা চান? পাবেন। ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি, রক্তারক্তি চান?

ছবি : সংগৃহীত

বাঙালির সংসারে তাও পাবেন। আর সঙ্গে পাবেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন। আমরা কি কখনও ফুটবল বিশ্বকাপের আসরে যোগ দিতে পারব? পশ্চিম আফ্রিকার কেপ ভার্দের মতো সাড়ে পাঁচ লাখ জনসংখ্যার দেশ বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল পর্বে পৌঁছে যেতে পারে। বিশ্বসেরার তাজ মাথায় থাকা লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে দিতে পারে। জিতে নিতে পারে ফুটবল দুনিয়ার হৃদয়। অথচ, ১৪০ কোটির ভারতবর্ষ পারে না। সত্য সেলুকাস, বড় বিচিত্র এই দেশ।

ভারত এখন ক্রিকেটের দেশ! ইতিমধ্যেই ক্রিকেট ভারতবাসীর কাছে ধর্মে পরিণত হয়েছে। অনেকেই এমন কথা প্রায়ই বলে থাকেন। হয়তো ক্রিকেট আসমুদ্রহিমাচলের মনের গভীর গহনে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু সেই মনের গভীরে ফুটবল কি সম্পূর্ণ ব্রাত্য? মনে হয় না। অন্তত চার বছর অন্তর ফুটবল বিশ্বকাপের সময় প্রতিবার যে আবেগের স্ফুরণ ঘটে গোটা দেশে, তারপর ভারতে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ নেই, এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ, বাস্তব ছবি ভিন্ন কথা বলছে। যার নির্যাস, সবাই পারে, ভারত পারে না। ফুটবলের আঙিনায় সব দেশই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যায়। প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশে স্কিল ও দক্ষতাকে আরও উন্নত করে। আর আমাদের দেশ ভারত শুধুই পিছিয়ে পড়ার সরণিতে থেকে যায়।

কিন্তু কেন? পিছনে রয়েছে নানা কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ হল, ১৪০ কোটি দেশের সব রাজ্যে ফুটবল খেলা হয়, এমন নয়। আমাদের দেশে এমন অনেক রাজ্য রয়েছে, যেখানে ফুটবলের চলই নেই। বাংলা, গোয়া, কেরল ও কিছুটা পাঞ্জাবকে বাদ দিলে দেশের বাকি রাজ্যগুলি ফুটবলকে কখনই গুরুত্ব দেয়নি। শেষ কয়েক বছরে দেশের উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ফুটবল কেন্দ্রিক আগেব প্রবলভাবে ডালপালা মেলেছে। কিন্তু সেটা বিদেশি ফুটবলের আবেগ। স্প্যানিশ লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের লাফালাফি আর যাই হোক না কেন, ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে দিতে পারেনি। ভারতীয় ফুটবলের মূল স্রোতে তার কোনও প্রভাবও পড়েনি। আমাদের দেশে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানকে নিয়ে যেমন আবেগ রয়েছে। তেমনই

পরবর্তী অংশ ২ পাতায়

পাট চাষের অনুকূল পরিবেশ ও কৃষক সহায়ক হল ভারত সরকার

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল "জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া" আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন। এদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল মূলতঃ পাট চাষকে কেন্দ্র করেই। কেন্দ্রীয় সরকার কুইন্টাল প্রতি পাটের (জুট) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এম এস পি) ২৭৫ টাকা বাড়িয়ে ৫৯২৫ টাকা ঘোষণা করেছে। উন্নত মানের পাটের ক্ষেত্রে (টিডি ১) এম এস পি নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫২৫ টাকা।

ওই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জুট কমিশনার নীরজ কুলকার্নি, জুট কর্পোরেশনের এমডি

ছবি : সুফল ভট্টাচার্য

সঞ্জয় কুমার পানীগ্রাহী, জেনারেল ম্যানেজার কল্যাণ কুমার মজুমদার এবং ন্যাশানাল জুট বোর্ডের সেক্রেটারি শশীভূষণ সিং।

পাট-এর তৈরী বহু দ্রব্য কলকাতায় মেলা ছাড়া খুব একটা দেখা যায় না। পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা খুব আছে তাও নয়।

এই প্রসঙ্গে উপস্থিত সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের তরফ থেকে জানান হয় যে, কেউ যদি পাট-এর তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে ব্যাসায়িক উদ্দেশ্যে এগোতে চায় তাহলে "জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া"র পোর্টালে সার্চ করে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পেয়ে যাবেন। এখন সকলের হাতেই স্মার্ট ফোন। কাজেই খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সব মিলিয়ে সেদিনের সাংবাদিক বৈঠক সুষ্ঠ ও পরিশীলিতভাবেই সমাপ্ত হয়।

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-7 ● July 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

শ্রাবনের শুরুতেই বাঙালির অন্যতম উৎসব ‘রথযাত্রা’। বাংলায় ধুমধাম করে হয়তো কালি-পটকা ফাটিয়ে নতুন সরকারের নতুন রথযাত্রার অনুষ্ঠান পালিত হবে।

সে হোক। কিন্তু বাংলার ‘অন্নপূর্ণা’রা যেটুকু পেত সেইটুকুও টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভ চরমে। কোনো কাজ না করে বসে বসে টাকা পেতে কার না ভালো লাগে। কাজেই না পাওয়ায় হতাশার শেষ নেই।

হয়তো আগামীদিনে সব ক্ষোভ বিক্ষোভ মিটে যাবে। কিন্তু সামনেই কিছু মাসের মধ্যে দুগ্গা মা আসবেন। অপেক্ষায় বাঙালি। কোন ব্যানারে কত আমদানি হয় নতুন সরকারের সৌজন্যে সেইমত প্ল্যানিং হবে ইয়ের সঙ্গে চাট কি থাকতে পারে। শুধুই এনজয়।

আরে বাবা গেরুয়া জামা পড়লে কি হবে? হৃৎপিণ্ড তো সবুজ রয়ে গেছে...

গেরুয়া শাসনের দু’মাস, বঙ্গ কি সত্যিই রামরাজত্ব পেল?

শমিক গোস্বামী : পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া রাজ প্রথমবার। বামপন্থী এবং কংগ্রেসী মনোভাবের মানুষদের তেঁতো লাগার কথা। বাম আবার শূন্যের খরা কাটিয়ে বিধানসভায় খাতা খুলেছে, তবু সংখ্যার নিরিখে পাত্তা পাওয়ার মতো নয়। কাজেই তাদের প্রভাব রাজ্য রাজনীতিতে নগণ্য। টেক-অফ করার পর বিজেপির উড়ান সঠিক পথে চলছে নাকি টালমাটাল অবস্থায় কোনোমতে পাঁচটি বছর, তারপর ফুস!

নির্বাচনের আগে কোটি কোটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। আর বাংলার সহজ সরল মানুষ একদিনের ছুটিতে মাংস - ভাত খেয়ে চুটিয়ে গেরুয়া জামায় টিক মেরে, ঘন নীল রং আঙুলে লাগিয়ে আহা কি ক্যাতাথ না হলাম বলে ভাত ঘুম। ব্যাস! স্বপ্ন সত্যি। চারিদিকে রাম—রাম! জয় মানে আরিব্বাস কোথায় ফুল আর কোথায় ঘাস!

জয় হল, শপথ হল, এবার মন্ত্রীসভা গঠন। বিজেপির ক্যাবিনেট কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক। শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল, দিলীপ ঘোষ ক্যাবিনেটের মূল স্তম্ভ। এছাড়া বর্ষীয়ান স্বপন দাশগুপ্ত, তাপস রায়, দুধকুমার মণ্ডল প্রমুখ। আদি এবং নব্য মিলে শুভেন্দুবাবুর ক্যাবিনেট জমজমাট।

জিরো টলারেন্স টু দুর্নীতি – এই হল এই ক্যাবিনেটের মূল নীতি। যা বাংলার মানুষের কাছে মানতে পারলে, সত্যি বড়ো পাওনা।

এছাড়া পরিবারতন্ত্র থেকে বেরিয়ে দলীয় গণতন্ত্রের পরিকাঠামো, বাংলার মানুষের জন্য ভালো বলা যায়।

শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এমন কিছু দলীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা বঙ্গবাসীকে চমকে দিয়েছে। বিশেষ করে কদিন আগে ঘটে যাওয়া উত্তরপ্রদেশ মডেলে “এনকাউন্টার” বেশ ভাবিয়েছে। ঠিক না ভুল সেই তর্কের লেখা পরে লেখা যাবে। বেশ কয়েকটি কাজ ভালো এগোচ্ছে। তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চিংড়িঘাটা মেট্রো রেল-এর অসমাপ্ত কাজ। আগের সরকার কিছুতেই এই কাজটি করে উঠতে পারেননি। বিজেপি সরকার খুব দ্রুততার সঙ্গে সফল হয়েছেন কাজটি করার বিষয়ে। তবে আগের সরকার কাজটি না করার একটা আঁশটে গন্ধ সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। সেটা হল বেলেঘাটা রুটের অটো স্ট্যান্ডের তোলাবাজির রাজনীতি।

স্বপন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে আদিগঙ্গা এবং সমগ্র কালীঘাট সংলগ্ন এলাকার সংস্কারের উদ্যোগও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের মানচিত্রে কালীঘাট মন্দির গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তীর্থস্থলও বটে। আদিগঙ্গা যা একসময় পুণ্যতোয়া ছিল, বর্তমানে ড্রেজিং-এর অভাবে নালায় পরিণত হয়েছে।

সেটি খুব শীঘ্র পূর্বের অবস্থায় ফেরানোর উদ্যোগ হয়তো নেওয়া হবে।

শহরকে জঞ্জালমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেই লক্ষ্য কতটা সফল হয়, সেটাই এখন দেখার।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসা মাত্র খিদিরপুর অঞ্চল সংলগ্ন তারাতলায় বহুতল বাড়ির কাঠামো চাপা পড়ে কুড়িজন শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনায় যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে বর্তমান সরকারক, তাতে সাধুবাদ না দিলে একটু অমানবিক হবে।

তবে কথায় আছে, সব ভাল তার শেষ ভাল যার। এতো সবে শুরু। শুরুতেই যুদ্ধংদেহি ভঙ্গিমায় কোথাও কিছু নেই—স্টেশন, ফুটপাতে হকার তুলতে শুরু করে দেওয়া। হকাররা হয়তো যেখানে সেখানে বসে বিক্রিবাটা করে পথচলতি মানুষের অসুবিধা করে, কিন্তু রাজ্যে চাকরি, শিল্প, সুস্থ সমাজব্যবস্থা কিচ্ছু নেই, রোজগারের পথ নেই তা করবেটা কি? ক’দিন সময় দেওয়া হয়তো যেত।

তবে সরকারি কর্মচারীদের ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধিতে রাজ্যের বহু মানুষ খুশি। কিন্তু পূর্বের সরকার বিপুল পরিমানে দেনা আর পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি করে বঙ্গবাসীকে পাঁকে চুবিয়ে দিয়ে গেছে, সেই পাঁক থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। শিল্পে বিনিয়োগ শুরু হয়েছে। জুট মিল খুলতে চলেছে শীঘ্র। সবমিলিয়ে তোলাবাজি যদি আগামীদিনে না হয়, তাহলে আগামীদিনে বাংলার মানুষ নতুন সূর্যের স্বপ্ন দেখলেও দেখতে পারে।

সবাই পারে

১ পাতার পর

বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, প্যারিস সেন্ট জার্মেইনের মতো ক্লাবগুলিকে নিয়েও উন্মাদনা রয়েছে প্রবল। এমন আবেগের প্রভাব ভারতীয় ফুটবলে পড়েনি কখনই।

লেটস ফুটবল। অনেক স্বপ্ন, আবেগ নিয়ে ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল আইএসএল। বিদেশের বহু কিংবদন্তি ফুটবলার ইতিমধ্যেই খেলে গিয়েছেন আইএসএলে। আখেরে ভারতীয় ফুটবলের কোনও লাভ হয়নি। বর্তমানে সেই আইএসএলের ভবিষ্যত নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। অশনি সংকেত। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন আর থাকতে রাজি নয় ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে। কেন? সহজ জবাব, ফুটবল নিয়ে উন্মাদন থাকলেও আয় হচ্ছে কই? ভারতীয় ফুটবলও আগামীর দিশা পাচ্ছে না। নেপথ্যের কারণ, গোড়ায় গলদ। মাস খানেক আগে জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে অনূর্ধ্ব-১৩ মহিলা ফুটবল স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জানিয়েছিলেন, ফুটবল খেলাটা সময়ের সঙ্গে বদলে চলেছে নিয়মিত। ৮-১০ বছরে একজন খুদে যখন ফুটবল শুরুর কথা ভাবছে, তখন তার শরীরের জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস প্রয়োজন।

চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ১৪০ কোটি দেশের বেশিরভাগ মানুষই একথা জানেন না। অথবা, জানলেও বেশিরভাগেরই কিছু করার থাকে না। কারণ, আমাদের দেশের ফুটবল প্রতিভার একটা বড় অংশ উঠে আসে জেলা স্তর থেকে। সেখানে না আছে সঠিক পরিকাঠামো, না রয়েছে প্রতিভাকে আগামীর দিশা দেখানোর দিশারী। চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়েও যদি কেউ তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলের মূল স্রোতে উঠে আসতে পারেন, তাহলে তাঁকে ক্লাব ফুটবলের অন্ধকার দিক, যার পোশাকি নাম কাটমানি। সঙ্গে উন্নততর প্রশিক্ষণের দুরাবস্থা তো রয়েছেই।

তাই ফিফা র‍্যাংকিয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা দেশও নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভারতকে অনায়াসে টপকে যায়। পৌঁছে যায় বিশ্বকাপের মূল পর্বে। আমরা, ১৪০ কোটির দেশ শুধু ‘চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন’।

প্রথম
সন্দেশ

“প্রথম সন্দেশ” সংবাদপত্রের জন্য সংবাদকর্মী চাই।

আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন 9836765148 এই নম্বরে

সকাল 12 থেকে দুপুর 3 টের মধ্যে।

মানবতার স্পর্শে সমাজসেবার নবজাগরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে, বড় পরিবর্তনের সূচনা হয় ছোট ছোট উদ্যোগ থেকেই। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা যখন এক সুতোয় বাঁধা পড়ে, তখনই জন্ম নেয় এমন কিছু উদ্যোগ, যা একসময় বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। কলকাতার সরকার-নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "পর্ণশ্রী পল্লী নবজাগরণ সমিতি" সেই রকমই এক মানবিক উদ্যোগ, যা প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজসেবার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছে।

২০২২ সালে পথচলা শুরু হয় এই সংগঠনের। সংগঠনের মূলমন্ত্র 'সার্ভিং কমিউনিটি উইথ হিউম্যানিটি', অর্থাৎ 'মানবতার সেবায় সমাজের পাশে'। নামের মধ্যেই যেমন নবজাগরণের আহ্বান, তেমনি কর্মকাণ্ডেও রয়েছে মানবিক মূল্যবোধকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনটি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.ppns.in)-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ৩৫-এরও বেশি এবং ইতিমধ্যেই প্রায় এক হাজারেরও বেশি মানুষের জীবনে তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সংখ্যার বিচারে হয়তো এটি খুব বড় নয়, কিন্তু সীমিত সামর্থ্য নিয়েও মানুষের কাছে পৌঁছনোর যে আন্তরিক প্রচেষ্টা সংগঠনটি চালিয়ে যাচ্ছে, সেটিই তাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংগঠনটি উপলব্ধি করেছে, সমাজসেবা শুধু আর্থিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্যভাবে পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত সমাজসেবার পরিচয়। সেই লক্ষ্যেই বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা সহায়তা, বস্ত্র বিতরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, বৃক্ষরোপণ, রক্তদান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে তারা। দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনটি ইতিমধ্যেই সমাজের বহু মানুষের কাছে একটি বিশ্বাসযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সেই বিশ্বাসযোগ্যতারই প্রতিফলন।

স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে "পর্ণশ্রী পল্লী নবজাগরণ সমিতি"-র অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ থ্যালাসেমিয়া

প্রতিরোধ ও সচেতনতা কর্মসূচি। বিশেষজ্ঞদের মতে, থ্যালাসেমিয়া এমন একটি বংশগত রোগ, যার ক্ষেত্রে সচেতনতা এবং সময়মতো রক্ত পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ থেকে থ্যালাসেমিয়া দূর করতে বিয়ের আগে কুষ্ঠী বিচার করার থেকেও রক্ত পরীক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে সংগঠনটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, আবাসিক হোম, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ বিভিন্ন জায়গায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও স্ক্রিনিং পরীক্ষা পরিচালনা করে আসছে।

সম্প্রতি ঠাকুরপুকুরের সেভ দ্য চিলড্রেন হোমে, সরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় আয়োজিত এরকমই একটি থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে প্রায় ১১৪ জন আবাসিকের রক্ত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। একইসঙ্গে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগের বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিরোধের গুরুত্ব নিয়ে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রসারে এই ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

সংগঠনের কর্মকাণ্ডের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এর বিস্তৃত কর্মপরিধি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, করঞ্জলি, ঘটিহারানিয়া-সহ জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া এবং দুর্গাপুরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে, শহর ও শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, বস্ত্র বিতরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানবিক সহায়তার মতো বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সমাজসেবা-মূলক কার্যক্রমের পরিধি শুধুমাত্র এই রাজ্যের সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলগুলিতেও প্রসারিত হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সংগঠনের এক সদস্যের ঐকান্তিক উদ্যোগে সুদূর বেঙ্গালুরুতেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। একটি স্থানীয় সংগঠনের কর্মকাণ্ড যখন ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায়, তখন তা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং মানবিক অঙ্গীকারেরই পরিচয় বহন করে।

শুধু স্বাস্থ্য বা পরিবেশ নয়, শিক্ষার প্রসারেও সংগঠনটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া, শিক্ষার প্রতি উৎসাহ জোগানো এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে তারা শিক্ষা ও মানবিকতার মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি দুর্গাপূজা বা বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে নতুন বস্ত্র কিংবা শীতকালে শীতবস্ত্র-সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের মতো কর্মসূচিতেও সংগঠনটির সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আজকের দিনে অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই সরকারি অনুদান কিংবা কোনো কর্পোরেট সংস্থার সি.এস.আর.-এর আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পর্ণশ্রী পল্লী নবজাগরণ সমিতির পথচলা কিছুটা ব্যতিক্রমী। কোনও সরকারি আর্থিক সহায়তা বা সি.এস.আর-এর থেকে প্রাপ্ত কোনো অনুদান ছাড়াই সংগঠনটি প্রথম দিন থেকেই তাদের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের শুভানুধ্যায়ী, স্বেচ্ছাসেবক, সদস্য এবং সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুদানের উপর নির্ভর করেই এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মানুষের বিশ্বাসই সংগঠনটির সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করাকেই তারা প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করে।

প্রযুক্তির ব্যবহারেও সংগঠনটি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে। নিজস্ব ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সমাজসেবামূলক উদ্যোগের তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। এর ফলে শুধু এই রাজ্যেই নয়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও এই সংগঠনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং অনেকেই এই মানবিক উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছেন।

সংগঠনের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি কর্মসূচির তথ্য ও আলোকচিত্র নিয়মিতভাবে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সংগঠনটির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

মাত্র চার বছরের পথ চলায় "পর্ণশ্রী পল্লী নবজাগরণ সমিতি" হয়তো বিশাল কোনও প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি, কিন্তু সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিকতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই বহু মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। সীমিত সম্পদ নিয়েও যে সুসংগঠিত পরিকল্পনা, নিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসাকে সম্বল করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বীজ বপন করা যায়, তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সংগঠন। আজ যখন সমাজের নানা প্রান্তে বিভাজন, স্বার্থপরতা ও উদাসীনতার ছবি সামনে আসে, তখন "পর্ণশ্রী পল্লী নবজাগরণ সমিতি"-র মতো সংগঠনগুলি মনে করিয়ে দেয়—মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আন্তরিক ইচ্ছাই সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শক্তি। মানবতার স্পর্শে সমাজসেবার এই নবজাগরণ আগামী দিনে আরও বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়ুক—এটাই প্রত্যাশা।

মন-হরণ করে জি.আই. ট্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাঙালি মানেই মিষ্টিমুখ। মঙ্গল, অমঙ্গল যে-কোনো অজুহাতে সন্দেশ, রসগোল্লা, মিষ্টি দই থেকে শুরু করে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে সাজানো সাদা, ঘিয়ে, লালচে ইত্যাদি রঙের বস্তুর দিকে চোখ যাবেই রসনা তৃপ্তির জন্য। বিশেষ করে কলকাতা সহ বাংলার যেকোনো প্রান্তে যদি চলার পথে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নজরে আসে দোকান অব্দি পৌঁছনো হোক না হোক মন কেমন করে। স্বীকার করছেন না তো? আরে চুপিচুপি বা মনে মনে বলুন, মিষ্টি দেখলেই জিভে জল আসে না, এমন মানুষ কমই আছেন!

বাংলার গর্ব রসগোল্লা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। ওড়িশা না বাংলা এইসব নানা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। থাক সেসব। হুগলির জনাইয়ে গ্যাছেন? যান। সেখানকার "মনোহরা" নামে মিষ্টি পেল জিআই

পরবর্তী অংশ ৪ পাতায়

Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-7 ● July 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬

আবেগের খেলায় প্রযুক্তির ছায়া

দেবাশীষ ব্যানার্জি : ফুটবলে একটি গোল মানে শুধু স্কোরবোর্ডে একটি সংখ্যা যোগ হওয়া নয়। একটি গোল বদলে দিতে পারে একটি ম্যাচ, একটি টুর্নামেন্ট, এমনকি একটি প্রজন্মের স্মৃতিও। বহু দশক ধরে দর্শকের কাছে গোলের মুহূর্ত এক নিখাদ আবেগের বিস্ফোরণ-বল জালে জড়ালেই গ্যালারি গর্জে ওঠে, খেলোয়াড়রা ছুটে যায় কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে, আর ধারা-ভাষ্যকারের কণ্ঠে ধরা পড়ে এক ইতিহাসের জন্ম। কিন্তু এখন অনেক সময়ই গোল হওয়ার পরেও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস রূপ নেয় এক রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায়; কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন অনেক ক্ষেত্রেই আসে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ('ভার') এবং সেমি-অটোমেটেড প্রযুক্তির বিশ্লেষণ থেকে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের একাধিক ম্যাচে প্রযুক্তির পর্যালোচনায় কোথাও ধরা পড়েছে অফসাইডের অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান, কোথাও আক্রমণের শুরুতে ফাউল, আবার কোথাও গোলরক্ষককে বাধা দেওয়ার অভিযোগ; ফলে বল জালে জড়ালেও গোলের স্বীকৃতি আসেনি।

তবে প্রযুক্তির এই কঠোর চোখ কেবল গোল বাতিলের 'খলনায়ক' হিসেবেই কাজ করেনি, অনেক সময় মাঠে চরম অবিচারের হাত থেকে দলগুলোকে বাঁচিয়ে খেলায় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ম্যাচের তীব্র

ছবি : সংগৃহীত

উত্তেজনার মুহূর্তে এমন অনেক সূক্ষ্ম ফাউল, হ্যান্ডবল বা ট্যাকল থাকে, যা খালি চোখে রেফারির এড়িয়ে যাওয়া বা ভুল বোঝা খুব স্বাভাবিক হলেও প্রযুক্তির ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। ২০২৬ বিশ্বকাপের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দেখা গেছে, রেফারি প্রথমে ফাউল বা পেনাল্টি না দিলেও, পরবর্তীতে 'ভার'-এর হস্তক্ষেপে এবং অন-ফিল্ড রিভিউয়ের মাধ্যমে সঠিক ফাউল বা পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে যে দলটি মাঠে অবিচারের শিকার হতে পারত, প্রযুক্তির কল্যাণে তারা সঠিক বিচার পেল। এই দিকটি প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তি শুধু আনন্দ কেড়ে নেওয়ার যন্ত্র নয়, বরং ফুটবলের মাঠে ন্যায্যতার এক বিশ্বস্ত প্রহরীও বটে বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে বহু ঘটনা আজও আলোচনার বিষয়। ১৯৬৬ সালের বিতর্কিত গোললাইন সিদ্ধান্ত, ১৯৮৬ সালের 'হ্যান্ড অব গড', ২০১০ সালে ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড-এর গোললাইন অতিক্রম করেও গোল স্বীকৃতি না পাওয়া-এসব ঘটনাই এক সময় ফুটবল বিশ্বকে প্রযুক্তির দাবি তুলতে বাধ্য করেছিল। আর সেই দাবির ধারাবাহিকতাতেই বিশ্ব ফুটবল নিয়ম ও প্রযুক্তির নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৌঁছেছে আজকের 'ভার'-যুগে, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তকে যতটা সম্ভব তথ্যনির্ভর ও নির্ভুল করার চেষ্টা চলছে।

২০২৬ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে অফসাইড নির্ধারণে। সেমি-অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি ও বলের ভেতরের সেন্সরের সাহায্যে এখন মিলিসেকেন্ডের নির্ভুলতায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এমনকি খালি চোখে অদৃশ্য ব্যবধানও 'ভার' শনাক্ত করতে পারছে। ফলে খেলোয়াড়ের শরীরের সামান্য অংশও অফসাইডে রয়েছে কি না, সেটা এখন নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফুটবল আইনে ব্যবধান নয়, অবস্থানই নির্ধারক। তবে প্রশ্ন উঠছে-এত সূক্ষ্ম পার্থক্য কি সত্যিই খেলায় প্রভাব ফেলে, নাকি এটি শুধু প্রযুক্তিগত নিখুঁততার প্রদর্শন?

শুধু অফসাইড নয়, অনেক ক্ষেত্রেই গোল হওয়ার পর আক্রমণের শুরুতে রেফারির চোখ এড়িয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম ফাউলও 'ভার'-এর মাধ্যমে শনাক্ত হচ্ছে। ফলে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে করা গোলও বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

এসব সিদ্ধান্ত সমর্থকদের মধ্যে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে-একদিকে ন্যায্যতার দাবি, অন্যদিকে ফুটবলের স্বাভাবিক শারীরিক লড়াইয়ের ঐতিহ্য।

বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এবং খেলার আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আই.এফ.এ.বি. বহু বছর ধরে ফুটবলে প্রযুক্তির ব্যবহারকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এবারের বিশ্বকাপে ব্যবহৃত হয়েছে আরও উন্নত 'ভার' ও সেমি-অটোমেটেড প্রযুক্তি। ফিফার প্রধান রেফারিং কর্মকর্তা পিয়ারলুইগি কলিনার মতে, নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য রেফারির কর্তৃত্ব কমানো নয়; বরং তাঁকে আরও নির্ভুল তথ্য দিয়ে সহায়তা করা। তাঁর দাবি, অধিকাংশ সিদ্ধান্ত আগের তুলনায় দ্রুত হয়েছে এবং খেলার কার্যকর সময়ও বেড়েছে।

২০২৬ বিশ্বকাপে বাতিল হয়ে যাওয়া বা রিভিউয়ের মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে বদলে যাওয়া সিদ্ধান্তগুলো শুধু পরিসংখ্যানের অংশ নয়, এগুলি আধুনিক ফুটবলের পরিবর্তিত দর্শনের প্রতীক। যেখানে একটি অসাধারণ ফিনিশ, দুরন্ত হেড, শেষ মুহূর্তের সমতাসূচক গোল কিংবা পেনাল্টির আবেদন-সবই শেষ পর্যন্ত আইন, প্রযুক্তি এবং রেফারির যৌথ বিচারের মুখোমুখি হয়। ঠিক এই কারণেই, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সেই চোখধাঁধানো গোল ম্লান হয়ে যায় আক্রমণের শুরুর এক ফাউলের রিভিউতে; পর্তুগালের বিরুদ্ধে ক্রোয়েশিয়ার শেষ মুহূর্তের সমতাসূচক গোলের উল্লাস কেড়ে নেয় অফসাইডের অতি সূক্ষ্ম রেখা; এমনকি নক-আউট পর্বে জার্মানির অতিরিক্ত সময়ের গোলটিও শেষ পর্যন্ত নাকচ হয়ে যায় গোলরক্ষককে বাধা দেওয়ার অভিযোগে। এই ঘটনাগুলি শুধু ম্যাচের ফলাফলই বদলায়নি, প্রযুক্তিনির্ভর ফুটবলের নতুন চরিত্রকেও সংজ্ঞায়িত করেছে।

সব মিলিয়ে ফুটবল যেন এখন এক নতুন বিচারব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছে, যেখানে প্রযুক্তি ক্রমশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক হয়ে উঠছে। ফলে আজকের ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে দুই বাস্তবতার মাঝখানে-একদিকে মানুষের আবেগ, অন্যদিকে প্রযুক্তির নির্ভুলতা।

হয়তো আগামী দিনে প্রযুক্তি আরও উন্নত হবে। সিদ্ধান্ত আসবে আরও দ্রুত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরও বড় ভূমিকা নেবে। তবু একটি বিষয় কখনও বদলাবে না-বল জালে জড়ানোর সেই প্রথম বিস্ফোরণ, গ্যালারির গর্জন, খেলোয়াড়ের উল্লাস আর কোটি কোটি দর্শকের একসঙ্গে হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত অথবা ন্যায্য পেনাল্টি বা ফ্রি-কিক না পাওয়ার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে সেই উল্লাস বা ক্ষোভেরও এখন এক নতুন বাস্তবতা আছে। মাঠে উচ্ছ্বসিত আনন্দ কিংবা তীব্র ক্ষোভের তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশের পরও শেষ কথা আর সেখানেই শেষ হয় না; কোন মুহূর্তে এক লহমায় সব সমীকরণ বদলে যাবে, তার চূড়ান্ত চিত্রনাট্য আজ প্রযুক্তির আঙিনাতেই লেখা হয়। আজ রেফারির বাঁশি আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতীক নয়; প্রযুক্তির সবুজ সংকেতের অপেক্ষাও সেই মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ফুটবলের এই নতুন সমীকরণে আবেগ আর প্রযুক্তি এখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযাত্রী। হয়তো আগামী দিনের ফুটবলের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে আবেগ আর প্রযুক্তির এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য-আর সেই ভারসাম্য অটুট রাখাই হবে আধুনিক ফুটবলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

মন-হরণ করে

৩ পাতার পর

ট্যাগ। অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী গ্রহণ যোগ্যতা বা সুনাম পাওয়া। প্রজন্মের পর প্রজন্ম কোনো অঞ্চলে একই ধরণের মিষ্টি তৈরী হচ্ছে এবং ভৌগোলিক উৎপত্তি ও বিশেষ গুণমানে আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে বহন করছে ওই মিষ্টি।

জনাইয়ের "মনোহরা" দুশো বছরের পুরোনো মিষ্টি। সেখানকার স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্রিটিশ শাসনের সময় হুগলির জনাইতে এক জমিদার বাড়ির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সন্দেশ বা মিষ্টি তৈরির কারিগর এসেছিল। জমিদারের আদেশ ছিল ভালো এবং উৎকৃষ্ট মানের মিষ্টি প্রস্তুত করার, যাতে অতিথিরা মুগ্ধ হয়। তাদের সেই স্বাদ যেন মুখে থেকে যায়! কারিগররা সেইমত ছানা, ক্ষীর, নারকেল, চিনি আর ছোটো এলাচের গুঁড়া দিয়ে অনন্য সংমিশ্রণে তৈরী করে এক মিষ্টি। অতিথিরা সেই মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করে ধন্য ধন্য করতে থাকেন। অতিথিদের মন হরণ করে নিল সেই মিষ্টি, নাম হলো 'মনোহরা'। মিষ্টির বাইরের অংশ চিনির শক্ত আবরণ এবং মিষ্টির ভিতর ছানার নরম তুলতুলে অংশ জিভে দিলেই চোখে মুখে ফুটে উঠবে তার অনন্য স্বাদের বহিঃপ্রকাশ।

কাজেই "মনোহরা" জি আই ট্যাগ পাওয়ার যথেষ্ট দাবিদার। অনেকেরেই হয়তো এখনো এই মিষ্টি খাওয়া হয়নি। কারণ কলকাতা বা শহরতলি অঞ্চলে সচরাচর 'মনোহরা' পাওয়া যায় না। সেই কারণে হুগলিতে একদিন ঘুরে আসুন আর জনাইয়ের "মনোহরা" নিজে খেয়ে আর সঙ্গে কয়েক পিস নিয়ে এসে কলকাতার কাছের মানুষকে খাওয়ান। আপনার পরম শত্রুকেও এই মিষ্টি দিলে দেখবেন সেও শত্রুতা ভুলে আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে!

প্রথম সন্দেশ
পড়ুন,
পড়ান,
বিজ্ঞাপন দিন।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com